সুবিমল মিশ্র

প্রেমের গল্প

সে দ্যাখে নেতা ধোপানী নিজের ছেলেকে মেরে রেখে কাপড় কাচছে। কাজ সারা হলে মরা ছেলেকে ফের বাঁচিয়ে তুলে বাড়ি নিয়ে যাবে। এই মেয়েরা দরকার মতো বাঁচিয়ে রাখে, দরকার মতো মেরে ফ্যালে।

আসতে পারবে ?
বোধহয় না···কেন ?
ধ্যেৎ, যদি কিছু বুঝতে পার খুলে না বললে···
তবে খুলেই বল।
সব কথা বুঝি খুলে বলা যায়···
বলতে বলতেই সে তার পেটে চিমটি কেটে দেয় আর ভালবাসা চিমটির জ্বালায় আহা উঁহু করতে করতে গড়াতে থাকে।

ছেলেটা গাছের তলায় বসেছিল। পরনে একটা সাদামাটা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট। চুলগুলো একটু কায়দা করে আঁচড়ানো। মেয়েটি পরে আছে সালোয়ার কামিজ। শ্যাম্পু করা চুল হাওয়ায় উড়ছে। কোলের ওপর খাতা। ছেলেটির নাম কাশীনাথ, মেয়েটি তাকে আড়ালে ভালবাসা বলে ডাকে। মেয়েটির নাম আশা। আশা বলছে ভালবাসাকে, ভালবাসা তুমি ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাচ্ছো তো ? আর বলো না আশা— বাবা তো এরই মধ্যে খানদুয়েক চিঠি দিয়েছেন। যেতে তো হবেই। ভেবেছিলাম এই ছুটির কটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাবো। কাশীনাথের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল আশা। তারপর বললো : ভালবাসা তুমি ইনজিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হলে কি হবে এখনো তেমনি গাঁইয়াই রয়ে গেলে। বলে ভালবাসার কোলে হাত রাখল। বিকেলের মিষ্টি রোদে শীতের আমেজ। আশা বাঁ হাত দিয়ে ভালবাসাকে কাছে টেনে নিয়ে নিজেই ওর

গালে একটা চুমু খেয়ে বসল। হাসল হি হি করে। কাশীনাথ শিউরে উঠলো : এ্যাই— করছোটা কি— লোকজন ঘোরাফেরা করছে চাদ্দিকে— খেয়াল নেই···। আশা এবার ফোঁস করল কপট রাগে : থাক লোকজন। আমি আমার লাভারকে চুমু খাচ্ছি তাতে কার কি···তুমি না সত্যি এখনো সেই গেঁইয়াই রয়ে গেলে। যাও বরং বাড়ি গিয়ে বাবার জমিজমা দেখাশোনা কর। কাশীনাথ মৃদু হেসে বললো : জানো তো তুমি, আড়াল না হলে আমার কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। গতকালই তো রেস্টুরেন্টে এতক্ষণ ধরে···। সে তো আমি বললাম বলে— তাই···আশা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, আর বলতে বলতে তার কনুইতে একটা মোক্ষম চিমটি কেটে দেয়। ভালবাসা চিমটির জ্বালায় আহা উঁহু করতে করতে গড়াতে থাকে। আশাই আবার শুরু করে : শোনো, ছুটিতে তুমি বরং দেশেই যাও। আমি তো থাকছি না। কোথায় যাচ্ছো ? আশা এবার বলে : কেন তোমাকে বলিনি আমার মামার বাড়ি দিল্লিতে। ক'দিন কাটিয়ে আসবো ওখানে। ওখানে পরিমলদার সঙ্গে সময় কাটাতে দারুণ লাগে। খুব স্মার্ট ছেলে। জিনস আর গেঞ্জি পরে বাইকে করে যখন আসে না কি হ্যান্ডসাম লাগে কি বলবো। ক'দিন খুব আনন্দে কাটবে। কাশীনাথ এবার গম্ভীর হয়ে গেল, বললো : পরিমলদা কে আশা ? ও— তোমাকে বলিনি। পরিমলদা আমার মামাতো ভাই কল্লোলের বন্ধু। খুব ইনটারেস্টিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে আড্ডা দিতে পারে— একটুও বোর লাগে না। খুব খোলা মেলা। দেখা-শোনায়ও ভালো— দিল্লি ইউনিভার্সিটির স্কলার। কাশীনাথ এবার ঢোক গিললো, তারপর বললো : ও···

ভালবাসা

সব সময়েই চোখে অন্ধকার দেখতাম। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারপাশে কেউ নেই— একটা বিশাল কালো গর্তের ভেতরে পড়ে যাচ্ছি— এরকম একটা অনুভূতি প্রায়ই হতো। নেশা ছেড়ে দিয়ে কাজেকর্মে মন দিতে সবাই বলতো কিন্তু ওসব কথা কিছুই আমার মাথায় ঢুকতো না। মনে হতো একটা পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। একপাশে গভীর খাদ, কে যেন আলতো ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিচ্ছে। পড়ে যেতে যেতে আমি ভয়ে নীল হয়ে যাচ্ছি, ঘুমের ঘোরেও বুঝতে পারতাম একবার নীচে আছড়ে পড়লে আমার হাড়গোড় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রচণ্ড আতঙ্কে ঘুমের ভেতর চেঁচিয়ে উঠতাম। আর ঠিক তখনই দেখতাম মা যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে, দু হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিচ্ছেন, তাঁর মুখে হাসি। মার মুখের সঙ্গে আশার মুখ একদম মিলে যেতো। আর মুখখানা এমন করুণ যে দেখে আমার নিজেরই কান্না আসতো। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শাসন করতেন, যেমন করতেন ছোটবেলায়। আমি একা— বড্ড একা···এভাবে বিপথে গিয়ে তুই কেন আমার মনে দুঃখ দিচ্ছিস ! বললে লোকে

বিশ্বাস করবে না আমি স্বপ্নের ভেতর স্পষ্ট দেখতে পেতাম মার দুচোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে আমার মাথায়, মুখে। মা তখন আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন। তাঁর মুখের চারপাশে কেমন এক অদ্ভুত হাল্কা আলো দেখতে পেতাম, স্বপ্নের ভেতর মাকে দেবীর মতো লাগতো, তারপরই একজোড়া ফর্সা হাতের ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙে যেতো. দেখতাম ঘরের আলো জ্বলছে, আশা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ানো ! সত্যিই ওই সময়টা আমি অধঃপাতে চলে গেছিলাম।

আশা

গায়ে চিমটি কাটলো। দু হাত দিয়ে চোখ রগড়ালো। না তো, সে জেগেই আছে। এ তো স্বপ্ন নয়। সারা ঘরময় একটা মৃদু গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। গন্ধটা তার খুব চেনা। তার ভালবাসা মাঝে মাঝে খায়। ওই তো ভালবাসা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে— তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তারপর দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। একটু একটু করে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে সে। দরজা বন্ধ। তবু কি করে এই পুরুষটি তার ঘরে এলো। সে বলতে গেল : আপনি এখানে এসে ভাল করেন নি। আমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। হাসিমুখে যুবকটি বললো : একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। একথা বলতে বলতেই তার ভালবাসা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকি স্বপ্ন দেখছে ? সারা ঘরে আবছা অন্ধকার। একটা জিরো পাওয়ারের লাইট জ্বলছে শুধু। আবার একটু একটু করে অন্ধকারের ভেতর থেকেই যেন যুবকটি এগিয়ে এলো তার দিকে। আমাকে দেখে তুমি খুশি হও নি ? আরো কাছে এগিয়ে এলো সে। আপনি আমার জীবনটা নষ্ট করবেন কেন ? আমি কি দোষ করেছি ? আমার স্বামী আছে, সংসার আছে। ভালবাসা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ কথা কাউকে কি বলা যায় ? তার শরীরটা গলে গলে পড়ছে, ঠিক যেন একটা মোমের পুতুল। সে হাত বাড়ালো না। চিৎকার করলো না। পাশেই তো পরিমল শুয়ে আছে। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ডাকবে ? তা হলে ঘরে কে এলো, কে ? ভালবাসা ? কিভাবে এলো ?

মেয়েরা অনেকেই আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একদিন কলেজ ছুটির পর সে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ পেছন থেকে একজন ডাকলো। ঘুরে দাঁড়ালো সে। শুনুন আপনার কাছে পি.ডি-র কালকের নোটটা আছে ? সে বুঝতে পারছিল মেয়েটি এই সুযোগে তার সাথে আলাপ করতে চায়। আমি তো কাল আসিনি ! তবে

কে যে বললো আপনি কাল এসেছিলেন। মহুয়ার পাশে বসেছিলেন। না— গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে। মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল : সব সময় নিজের মুখটা ওরকম জাম্বুমানের মতো করে রাখেন কেন ? জাম্বুমান— সে অবাক। মেয়েটি মৃদু হেসে : সত্যিই আপনি একটা জাম্বুমান— বলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গিয়েছিল। আর তখনই কাশীনাথের কথায় খিলখিল করে বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে উঠল আশা। তারপর বললো : ভালবাসা, তুমি না একটা যাচ্ছেতাই। বলে, একটা ছোট মতন চিমটি কেটে নিয়ে কাশীনাথের হাতে একটা হাত রেখে শুরু করলো : ভালবাসা, কাল আমাদের বাড়িতে কেউ থাকছে না। তুমি দুপুরবেলা চলে এসো। কেন কোথায় যাবে সব ? জিজ্ঞাসা করল কাশীনাথ। আশা বললো : বাপি মাকে নিয়ে সল্টলেকে এক মাসির বাড়ি যাবে। ফিরবে একেবারে রাতে খেয়েদেয়ে। আর দাদা তো দু'দিন ধরে কলকাতায় নেই। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় গেছে। বাড়ি একদম ফাঁকা। চাকরটাকে দশটা টাকা দিয়ে সিনেমায় পাঠিয়ে দিলেই···। এখন সে ক্যামাক স্ট্রিটের বাইশতলা হাই-রাইজের ষোড়শতলায় গড়ে ওঠা জয়েন্টে সপ্তাহে দু-তিনদিন যায়। এখানে এলেবেলে লোকেরা আসে না। তবে উঠতি পয়সাওয়ালারা মাঝে মধ্যে এক-আধজন এসে পড়ে। মেয়েটি বলল : এখানে আপনি আমার ক্লায়েন্ট। আমি আপনার এন্টার-টেনার। এর বেশি আর কিছু না। মেয়েটি হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে থাকে। এরপর এক সময়ে ঘরের জিরো পাওয়ার সবুজ আলোটা জ্বলে উঠবে, মেয়েটি তার বাপের বয়সী মদ্যপ লোকটার ট্রাউজারের চেনটা দুটো অভ্যস্ত আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে নামিয়ে দেবে, দিতে থাকবে। কি ব্যাপার কাকাবাবু, কেমন আছেন ? বাবা, তুমি তো অনেক দিন হল এসেছো একবার আমাদের বাড়িতে এলে না কেন ? ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছে। ভদ্রলোক একটু কেশে : বাবা, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। বলুন কাকাবাবু। তোমাকে আর কি বলবো বাবা, তুমি আমার ঘরের ছেলের মতো। আমার ছোট মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। তুমি যদি ওকে দেখিয়ে টেখিয়ে দাও তো খুব ভালো হয়। ও-ই তোমার কথা বলছিল। না, কোনো কিন্তু নয় বাবা। তার পরের দিনই আশা পড়তে এলো তার কাছে। হাতে বই, মুখে হাসি। দরজায় দাঁড়িয়ে বললো : আসবো। এসো। সে মুখ তুলে দেখলো। এর আগে কোনো মেয়েকে সে সেইভাবে মুখ তুলে দেখেনি। গম্ভীর আর লাজুক স্বভাবের জন্য গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা তাকে এড়িয়ে চলে। বসবো। বসো। বইপত্র রেখে বসলো আশা। মুখোমুখি চেয়ারে সে। মাঝখানে পড়ার টেবিল। মাধ্যমিক দেবে এবার ? হ্যাঁ, মাথা নীচু করে আশা জানালো। তুমি কোন্ সাবজেক্ট পড়তে চাও ? যা পড়াবেন। সে সোজা মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। আশা চোখ নামিয়ে নিল ! ছেলেটি আমার মুখোমুখি এসে জিজ্ঞাসা করলো যদি আপনি কিছু মনে না করেন তা হলে আপনার নামটা জানতে পারি ? সেই মুহূর্তে বাবার কঠোর শাসনের কথা ভুলে

গিয়ে আমি ওকে নাম বললাম। বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো আপনার। ততক্ষণে আমিও একটু সাহস ফিরে পেয়েছি। আমি পাল্টা ওকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনার নামটা বললেন না তো। ছেলেটি হেসে ফেলল : আপনি আমার নাম আদৌ জিজ্ঞাসা করেছেন নাকি ? আমি বললাম : এবার তো জিজ্ঞাসা করলাম। ছেলেটি তার নাম বলল : কাশীনাথ। আমি বললাম : কি বুড়ো বুড়ো নাম রে বাবা—যাচ্ছেতাই। আপনার নামের সঙ্গে আপনার চেহারার কোনো মিল নেই। আপনাকে আমি ভালবাসা বলে ডাকবো—কেমন ? আমার কথা শুনে কাশীনাথ হেসে উঠলো। তার হাসিতে আমিও হাসলাম। সে হাসতে হাসতে বললো : আপনি হাসলে ঠিক আমার মায়ের মতো লাগে। আমি অবাক হলাম : ভালবাসা, তুমি এ কি বলছো ? তখন ছুটতে ছুটতে শংকর এসে ওর পাশে দাঁড়ালো ! একটু আড়চোখে তাকিয়ে বললো : কি গুরু এসব কি শুনছি ? কি ব্যাপার বলতো শংকর ? তুমি তো ভালো ছেলে। কিছু মনে করো না। বলছি যে আমার লাভারের সঙ্গে ইয়ে টিয়ে করো না মাইরি। সে গম্ভীর হয়ে বললো : আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, কি বলছো যা তা ? …দ্যাখো গুরু, বেশি ভ্যানতারা করো না। কি বলতে চাইছি তুমি ঠিক বুঝতে পারছো। সাফ সাফ বলছি গুরু আশার সঙ্গে আশনাই করলে আমি কিন্তু সহ্য করবো না। সে এবার রীতিমত রেগে গেল : এসব কি বলছো তুমি —আমি ওকে পড়াই। ওকে আমি আমার বোনের মতো দেখি। সে আর দাঁড়ালো না। সোজা হাঁটতে শুরু করলো। শংকর পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলতে থাকলো : সেটাই বজায় রাখার চেষ্টা করো দোস্ত। তা না হলে…। একা একা বাড়ি ফেরার সময় আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম যেখান থেকে বাসে উঠি সেখানে প্রতিদিন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমাকে দ্যাখে। ছেলেটাকে দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম আর ভালো ঘরের বলেই মনে হতো। ওর চোখ দুটো ছিল ভারি সুন্দর। ওই চোখ জোড়া আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহিত করে তুলতো। ওর প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। তাই ছেলেটি যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসতো আমিও হেসে তার প্রত্যুত্তর দিতাম। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য মনটা ছটফট করতো। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে যেতো বাবার কঠোর শাসনের কথা। আমাকে দেখেই বাবা বলল : কি ব্যাপার আশা, ফিরতে এতো দেরি হল কেন ? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম : দুটোর পর একটু লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে নোট নিতে নিতে দেরি হয়ে গেল। বাবা বললেন : আশা, তুমি এখন বড় হয়েছো, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছো। আশা করি তুমি এমন কোনো কাজ করবে না যাতে আমাদের সম্মানহানি হয়। আমি চুপচাপ মাথা নীচু করে বাবার কথা শুনে গেলাম। পড়তে এসে সে মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যেন ভাবে। এটা টের পাবার পরের দিন আশাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো সে : তুমি মাঝে মাঝে কি ভাবো। অন্যমনস্ক হয়ে যাও পড়তে পড়তে। না না, ও কিছু নয়—আপনি পড়ান। আশা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা

করে। তার মনে হয় ও যেন কিছু একটা চেপে যাচ্ছে। আবার জিজ্ঞেস করে : তুমি কিছু চেপে যাচ্ছো আশা। আমাকে খুলে বলো। প্রথমটা চুপ করে থাকে সে। তারপর মৃদু স্বরে বলে : শংকরদা সব সময় আমার পেছনে লাগে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দল বেঁধে। ওদের আমার ভয় করে। গম্ভীর হয়ে যায় সে। কিছু না ভেবেই বলে ফ্যালে : পড়ার পর আজ আমি তোমাকে এগিয়ে দেবো। না না —আঁতকে ওঠে আশা —আমি একাই যেতে পারবো। শংকরের বন্ধুরা সব ভয়ংকর টাইপের। কোনো খারাপ কাজ করতে ওদের হাত কাঁপে না। আপনার ওপরেও···। ঠিক আছে সে আমি বুঝবো। খুব একটা সাহস দেখালো সে। যে সব কথা বলে ফেলেছে তারপর আর ফিরে আসা অসম্ভব। তারপর কিছুটা ইতস্তত করে বললো : আচ্ছা ঠিক আছে, কাল থেকে আর তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই যাবো পড়াতে। তারপর একসময় সে কানের কাছে মুখটা এনে আদুরে গলায় বললো : চলো না আশা, এবার কোথাও চলে যাই দুজনে মিলে। সে কি —কোথায় যাবো ? দুজনে মিলে আলাদা কোথাও ঘর বাঁধবো। সুখে সংসার করবো। সে আবার কখনো হয় নাকি —আমি এই ঘর সংসার ফেলে যাবো কোথায় ? কেন আপত্তি কিসের —ওই লোকটা তো তোমাকে সন্দেহ করে। তারচেয়ে শুধু তুমি আর আমি মিলে গড়ে তুলবো নতুন সংসার। সে এক সময় বলে : তা হলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো ? কেন এই তো আমি আছি। সে তো মাঝে মাঝে, লুকিয়ে চুরিয়ে। পুরোটা পেলে তো দুদিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। রোজ রোজ একই জিনিস বেশিদিন ভালো লাগবে না। তোমাকে তো আমি চিনি। বলতে বলতে সে আমার গালে চিমটি কেটে দিল। বেশ জোরে। গালটায় জ্বালা করছিল। সেদিন সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। বৃষ্টি হলে আমার ঠিক ঘুম হয় না। হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। তখন রাত প্রায় বারোটা। চুপচাপ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি। মায়ের কথা মনে পড়ছে। খাওয়া দাওয়ার পর গড়িয়ে নেওয়ার ফাঁকে মা একটু কথামৃত পড়তেন। তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। সেই মা এখন কোথায় ! কেন মায়ের বদলে তো আশা এসেছে —আসেনি ? পাশের ঘর বন্ধ, নিস্তব্ধ। বন্ধুবান্ধব কারো আজ দেখা নেই। এই দুর্যোগের রাতে কেই বা বেরোবে। রাত যত বাড়তে লাগল, ততই বৃষ্টির চাপ বাড়তে থাকল। একটা পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়েছিলাম। হঠাৎ দরজায় খুট খুট শব্দ। কড়া নাড়াচ্ছে না অথচ শব্দ করছে। কান পেতে থাকলাম। আবার শব্দ। এই দুর্যোগের রাতে কে আমাকে ডাকতে এলো। বিছানা থেকে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর তখনি আবার খুট খুট শব্দ। জিজ্ঞেস করলাম কে ? বাইরে থেকে নারী কণ্ঠের চাপা শব্দ : আমি, দরজা খোলো। আশা—স্পষ্ট শুনলাম আশার গলা। আশা ! এত রাত্রে ! কিছু ভাবার আগেই আবার চাপা অথচ তীব্র কণ্ঠে তাড়া লাগালো : শিগগির খোলো—ভিজে যাচ্ছি। বাইরে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে এই ডাক কারোর পক্ষে শোনা সম্ভব

নয়। দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্রই ঘরে ঢুকে এল সে। আপাদমস্তক বর্ষাতি মুড়ি দেওয়া, মুখে রহস্যময় হাসি। ঢুকেই বললো : দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও, শীত করছে। ইতস্তত করছিলাম। ও চোখের দিকে তাকিয়ে বললো : বলছি, আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও। খুব ঠাণ্ডা লাগছে আমার। দরজা বন্ধ করে বললাম : এত রাত্রে আমার ঘরে—এভাবে! বলল : যা বৃষ্টি—একা একা ঘুম আসছিল না। ওর তো নাইট ডিউটি তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে লুডো খেলে সময়টা কাটিয়ে দিই। সাপলুডো আছে না তোমার? সাপলুডো খেলতে আমার দারুণ মজা লাগে। তারপর একটু থেমে স্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে : কিছু মনে করলে না তো? তখন চেঁচিয়ে তাকে ডাকল শংকর : আরে দোস্ত চললে কোথায়? সে গম্ভীর হল। বললো : শংকর, তুমি যা করছো ভালো হচ্ছে না। আরে আর জ্ঞান দিও না গুরু। ওসব আমার জানা আছে। আমার সঙ্গে তোমার দিলচিসপি করাটা ঠিক হচ্ছে না ইয়ার। আমি কিন্তু লাইন ক্লিয়ার করে নেবো। দুদিন চারদিন··ব্যাস। ঠিক আছে দেখা যাবে। সাহসে ভর করে আস্ফালন দেখালো সে। তারপর দ্রুত সরে গেল সেখান থেকে। মাসখানেক বাদে আবার সেদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে আসছে সে। ক্লান্ত। শংকর এসে সামনে দাঁড়ালো। সঙ্গে আরো তিনজন। তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। হেসে শংকর বললো : আরে কি খবর বলো। সেদিন রেগেমেগেই কেটে পড়লে ইয়ার···। সে যথারীতি গম্ভীর। তবু মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে : খবর তো ভালোই। হঠাৎ শংকরের দোস্তটি, গুণ্ডা মতন দেখতে যে, বুকখোলা সার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের লোম চুলকোতে চুলকোতে : এখনো কি গুরু ভাইবোন চলছে না লায়লা মজনুতে এসে পেঁাচেছে? সে একবার দেখলো ওকে। একেবারেই লোফার ধরনের। তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। সে কিছু উত্তর না দেওয়াতে আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলো : আমাদের একটা করে ওরকম বহিন জুটিয়ে দাওনা মাইরি···। এবার আর মাথা ঠিক রাখতে পারলো না সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে ছেলেটার গালে একটা থাপ্পড় মারলো। মেরেই বুঝতে পারলো ঠিক করেনি। নাঃ, এত সাহস তার নেই, ঝোঁকের মাথায় যাই করে ফেলুক শংকরদের গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তারা তৈরি হয়েই ছিল। ছেলেটা ততক্ষণে সাইকেলের চেন বের করে ফেলেছে, শংকর তেড়ে এসে চেপে ধরেছে হাত, পেছন দিকে মুড়ে ধরে খিস্তি দিচ্ছে : শালা ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির···। দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয় নি ···কিছু খাবে? না থাক। আচ্ছা ভালবাসা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো? কি কথা? তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো? সে কি কথা! আগে বলো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কিনা। কিন্তু তুমি কোথায়? জানি না। সত্যি করে বলো তুমি কোথায়। হারিয়ে গেছি। কি নিয়ে বাঁচবো আমি? যা নিয়ে এতদিন বেঁচে ছিলে। সে তো হারিয়ে গেছে। না তা আমি বিশ্বাস করি না। দুঃখ করো না ভালবাসা, যা হবার হয়েছে। তোমাকে তো

বাঁচতে হবে। অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। চোখ মেলে দ্যাখে আশা অসভ্যের মতো শুয়ে আছে। গায়ের চাদরটা তুলে আশার সারা শরীর ঢেকে দেয় ভালবাসা। তারপর স্কুটারটা দাঁড় করিয়েই সোজা চলে এল আশার সামনে। কি খবর? অনেকদিন পরে দেখলাম। স্বামী-সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। কেমন আছেন বলুন? আশ্চর্য ভালবাসার গলায় এখন আর কোনো জড়তা নেই। অথচ আগে কথা বলতে গেলে আটকে যেতো। আশা থ। তার ভেতরটা কেমন যেন করছে। কোনরকমে বললো: ভালো। নিজেই বুঝতে পারলো এ তার কণ্ঠস্বর নয়। এমন কি জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল আপনি কেমন আছেন। ভালবাসা হঠাৎ করেই তুমিতে চলে আসে। জিজ্ঞেস করলে না আমি কেমন আছি। বলো কেমন আছো? বল দেখি কেমন আছি—দেখে কি মনে হয় তোমার? বলতে বলতে ভালবাসা তার চোখে চোখ রাখে। আশা চোখ নামিয়ে নেয়। হ্যাঁ, মজার ব্যাপার ঐ সময়ে সত্যিই অনেক ঘটেছে। একবার পরিমল বেড়াতে এসেছে আশাকে নিয়ে। হঠাৎ মাথাটা বন বন করতে লাগলো, তাকে দরজার পেছনে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগলাম, তারপর সবার অলক্ষে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথরুমের ভেতরে। আশা চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু আমার শরীরে তখন অসুরের শক্তি ভর করেছে। ভাগ্য ভালো বাথরুমের দরজাটায় ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিইনি! একটু পরেই দরজা খুলে গেল, বাড়ির লোকেরা ভিতরে ঢুকে আমার হাত থেকে আশাকে উদ্ধার করলো। টানতে টানতে আমায় নিয়ে গেল কলের কাছে, মাথাটা বেসিনের ওপর চেপে ধরে কল খুলে দিল। এত কাণ্ডের পরেও পরিমল নিজের গাড়ি করে আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়েছিল। আমি গাড়ির পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে পড়েছিলাম। আমার আবছাভাবে মায়ের মুখ মনে পড়ছিল। মা খাওয়া দাওয়ার পর কথামৃত খুলে বসেছেন। কানে আসছিল সবাই আমার জন্য দুঃখ করছে। বন্ধুরা বার বার বলছিল মা মারা যাবার পরেই নাকি আমি বখে গিয়েছি। পরে আশাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। সে হাসি মুখে মুখ তুলে তাকালে আমি চমকে উঠেছিলাম। আশার মুখের সঙ্গে মায়ের মুখটা এত গুলিয়ে যায় কেন আমার। মাথা ঘুরে গিয়েছিল, দরজার পাল্লাটা ধরে ফেললাম। আশা হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললো: কিছু খাবে? না গো, সেদিন আমি কিছু মনে করিনি। অফারটা এসেছিল ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো। মধ্যবয়সী এম. ডি-টি বড়ই নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দিতে হবে। তবেই চাকরিটা হতে পারে। ও পাড়ারই একটি মেয়ে টোপটা তাকে দিয়েছিল ক্যাজুয়েলি। বলেছিল: জীবনটা সহজভাবে নে, ওরকম হামেশাই হচ্ছে আজকাল। ব্যাপারটা যতটা সামান্য ভেবেছিলাম কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই হলো। নির্দিষ্ট দিনে সেজেগুজে সেই বন্ধুর সঙ্গে হাজির হলাম লোকটার ফ্ল্যাটে। মধ্য কলকাতার পশ এলাকায় ওয়েল-ডেকোরেটেড ফ্ল্যাট। ঘরের মধ্যে এম ডি-র সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে নিতে বলে তার প্রিয় বন্ধুটি তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে

চলে গেল—বললো : একটু বাদে ঘুরে আসছি। নারীর স্বভাবসুলভ অনুভূতি বিপদের গন্ধ পেয়েছিল এর পরে পরেই। নিজের নিঃসঙ্গতা নিয়ে নাকী-কান্না কেঁদে, কখনো কথার মোহ ছড়িয়ে সেই ভদ্রলোকটি যখন সরাসরি ড্রিংকস অফার করলো তাকে, তখনও ততটা ঘাবড়ে যায়নি সে। এরপর ক্রমশ কমে এসেছিল সৌজন্যবোধের দূরত্ব। এয়ার-কন্ডিশন্ড ঘরে বসেও তার সারা শরীর জবজব করছিল ঘামে। কিন্তু বাঁচতে তাকে হবেই। কারো কাছে সে হাত পাতবে না। এমন কি ভালবাসার কাছেও নয়। ভীষণ নাটকীয় সুরে বাবার বয়সী সেই এম.ডি-টির গলা পেঁচিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসহিসে গলায় বলেছিল : এ্যাই-প্লিজ আজ না···আজ আমার আবার··· কামিং সাটারডে তোমার জন্য —শুধু তোমার জন্য —কেমন···। তবুও এত সহজে মেটেনি লোকটার চাহিদা। কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল তাকে, তবু সে মোটামুটি একটা বাঁচতে পেরেছিল সেদিন। বাঁচতেও হবে, আবার ভদ্রতা বজায় রাখতেও হবে। আর একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল আশারই ফ্ল্যাটে, তার জন্মদিনে। কে যেন আমার লাইটারটা সরিয়ে রেখেছিল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি পকেটে লাইটার নেই। আশা তখন রান্না ঘরে নিজের হাতে একটা বিশেষ চিকেন প্রিপারেশন বানাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম রান্না ঘরে গেলে নিশ্চয়ই ম্যাচিস পাওয়া যাবে। রান্না ঘরে ঢুকে কিন্তু কাউকে পেলাম না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কেমন যেন সব এলোমেলো লাগছে। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো : এখানে কি হচ্ছে শুনি···। চমকে পেছন ফিরে দেখি আশা দাঁড়িয়ে, তার পাশে তার বন্ধুরা। সবাই চুপ করে আমার কাণ্ড দেখছে। বললাম দেশলাই খুঁজতে এসেছিলাম, আমার লাইটারটা হারিয়ে ফেলেছি। দেশলাই খুঁজতে —আশা চোখ পাকিয়ে বললো —তাই বলে তুমি না বলে আমার বেডরুমে ঢুকবে ? জানো না, অনুমতি না নিয়ে মহিলাদের শোবার ঘরে ঢুকতে নেই। শোবার ঘরে কি দেশলাই পাওয়া যায় ? সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হল। দেখলাম রান্নাঘর ভেবে আমি ভুল করে শোবার ঘরেই ঢুকে পড়েছি। অনেকেই ততক্ষণে মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছে। আশা তারপর একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে হাতের মুঠো থেকে আমার লাইটারটা বের করে বললো : এই নাও তোমার লাইটার। তুমি যখন ড্রিংক করছিলে তখনই আমি এটা তোমার পকেট থেকে তুলে নিই হাঁদারাম। বলে আমার ঘাড়ে আলতো করে একটা চিমটি কাটল সে। আমি বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। □